সুবোধ সরকারের একশো কবিতা : প্রতিদিন নতুন, চিরদিন অমলিন

ড. তপন বাগচী

সুবোধ সরকার (জ. ১৯৫৮) সত্তর দশকের শীর্ষস্থানীয় কবিপ্রতিভার নাম। বাংলা আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। কলেজে ইংরেজি পড়ান। স্ত্রী মল্লিকা সেনগুপ্ত ভালো কবিতা লেখেন। কবিতা পড়ার আগেই সুবোধের নাম এইভাবে ভেসে আসত বাংলাদেশে। অগ্রজদের কাছে শুনতে-শুনতেই আগ্রহ জমে। পত্রিকা মারফত পড়েও ফেলি কিছু কবিতা। আরে এ যে অন্যমাল! গল্পের ঢঙে লেখা কবিতা ষাটের দশকেই যা আমরা ফেলে এসেছি, সত্তরে-আশিতে-নব্বইয়ে এসে সুবোধ সেই আঙ্গিকেই লিখছেন, লিখে চমকে দিচ্ছেন! কবিতার ইতিহাসের আঙ্গিকের গুরুত্বকে বেশ বড় করে দেখা হয়। সেই দেখার ধারাকেও এখন নতুন করে দেখতে হবে। সুবোধের বলার ভাষা আর টেকনিক অন্যদের চেয়ে ভীষণ আলাদা। আমি সুবোধের কবিতায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকি।

সত্তরের জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, রণজিৎ দাশ, অজিত বাইরী, শ্যামলকান্তি দাশ, রফিক উল ইসলাম, সৈয়দ হাসমত জালাল, সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়, ধূর্জটি চন্দ, গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুস শুকুর খান প্রমুখের কবিতা পাঠ করেছি নানান ছুতোয়। অজিত বাইরী এবং সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশক'টি আমার মুখস্থ ছিল। সুভাষের কবিতা তো রীতিমতো আবৃত্তি করেছি। শ্রোতারা ভাবতেন আমি বুঝি মুখোপাধ্যায়ের বদলে ভুল করে গঙ্গোপাধ্যায় বলেছি। এঁদের কারোর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। সকলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে ঢাকায় বিভিন্ন সময়ে এঁরা যখন 'সাহিত্য করতে' এসেছেন। এঁদের মধ্যে শ্যামলকান্তি দাশের একটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা লিখেছিলাম ঢাকার পাক্ষিক 'অন্যদিন' পত্রিকায়। সমালোচনা তো নয়, অনুজ কবির পাঠপ্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। আমি তো সমালোচক নই। পেশায় অধ্যাপক হওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই। কবিতা লেখার চেষ্টা করি, কবিতার বই হাতে পেলে পড়ি, ইচ্ছে হলে পাঠপ্রতিক্রিয়া জানাই। সেইরকম অনুভূতি নিয়েই সুবোধ সরকারের একশো কবিতা পাঠ করেছি আর এখন এই লেখার পাঠকদের সঙ্গে আমার অনুভূতি শেয়ার করতে চাই

২০০২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ঢাকার বিয়াম (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট) মিলনায়তনে সত্তর দশকের কবিদের একটি সম্মেলনে দুই বাংলার কবিরা অংশ নেন। আলোচক হিসেবে ছিলেন বিভিন্ন দশকের কবিরা। কিন্তু ঢাকার সত্তর দশকের কবিরা কোনো অজানা স্বার্থে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁদের কেউ কেউ পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে ওই উৎসব বর্জন করে। নব্বই দশকের একজন কবি হিসেবে আমিও ছিলাম একটি পর্বের নির্ধারিত আলোচক। কিন্তু সত্তরের এক শ্রদ্ধেয় কবি আমাকে ওই উৎসবে আলোচনা না করার অনুরোধ জানান। উপস্থিত উভয়সংকট। তুই পক্ষেই আমার শ্রদ্ধেয় কবিরা রয়েছেন। শ্যাম রাখি না কূল রাখি। পরে সিদ্ধান্ত নিই যে, অনুষ্ঠানে যাব, কবিতা শুনব কিন্তু আলোচনার সময় বাইরে চলে যাব। শ্যামও থাকবে, কূলও থাকবে। কিন্তু গিয়ে দেখি যারা আমাকে নিষেধ করেছেন, তাদের অনেকেই ওই অনুষ্ঠানে গেছেন, মঞ্চে উঠেছেন এবং কবিতা পাঠ করেছেন। হা হতোস্মি! তাহলে সাতে-পাঁচে না থাকা আমাকে নিষেধ করা কেন! লাভের মধ্যে বড় লাভ হলো ওই অনুষ্ঠানেই কবি সুবোধ সরকারের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা লাভ করা।

সুবোধের কবিতায় একটা গল্প থাকে। লাবণ্যময় ভাষার ওপর ভর করে তরতর করে এগিয়ে যায় তাঁর ডালপালা। তারপর মোক্ষম কোনো শব্দ বা চরণ পাঠকের চোখে ছুঁড়ে মেরে সরে পড়েন কবি। আমাদের সামনে কবির মুখ আর ভাসে না। ভাসতে তাঁর কবির কথা, বাণী, অন্তর্নিহিত সুর ও সৌন্দর্য। 'সেই সাংঘাতিক লোকটা'র কথা যখন তিনি বলেন তখন তার কিছু নচ্ছার কর্মকাণ্ডের কথা বলে লোকটি সম্পর্কে পাঠককে ক্ষুব্ধ করে তোলেন। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি যে পোড়ায়, ইহুদিদের ইজরাইলে যে ঢুকতে দেয় না, বাবরি মসজিদ যে ভাঙার কথা বলে, তাকে কেবল কবি চেনেন না, পাঠকও চেনেন। সাংঘাতিক লোকটার কর্মকাণ্ডের কথা শুনে পাঠকের মনে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আর সেই সময়ে কবি বলে উঠেন–

> আপনি জাগ্রত? তাই যদি হবেন
> তা হলে আপনার গগনস্পর্শী মূর্তি থেকে
> দুটো হাত বেরিয়ে এসে ডিনামাইটের রিমোট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা
> ওই সাংঘাতিক লোকটার দুটো চোখ সাদা করে দিচ্ছেন না কেন?
> [সেই সাংঘাতিক লোকটা, 'একশো কবিতা', পৃ. ১২]

এমনই সাবলীল ভাষা চরম কথা বলতে পারেন কবি সুবোধ সরকার। আমেরিকা তথা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছেন সুবোধ। 'আমেরিকা ১১ই সেপ্টেম্বর' নামের কবিতায় একটি প্রতীকী গল্প সাজিয়েছেন। স্কুলের বলরাম নামের একটা দুর্ধর্ষ ও দীর্ঘাঙ্গি ছেলে সবাইকে জ্বালাতন করত। হেডমাস্টারও তার ভয়ে তটস্থ থাকত। তো অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একদিন খর্বাঙ্গী এক ছেলে চেয়ারের উপর উঠে ঘুষি মেরে বলরামের নাক ফাটিয়ে দেয়। আমেরিকার নাক যেভাবে ভেঙে দিয়েছে লাদেন, তা প্রকাশ করতে এই গল্পের জুড়ি নেই। এরকম প্রতীকী গল্প আছে 'ভারত পাকিস্থান' নামের কবিতায়। মুশাররফের হাতে যদি পাকিস্থানের আর বাজপেয়ির হাতে ভারতের শাসনভার অর্পিত হওয়া আর ঘরের অবুঝ শিশুর হাতে চাবি রাখতে দেওয়া যে সমার্থক সেই কথাটি বলা হয়েছে শ্লেষ মিশিয়ে। তবে 'আবে চোপ, শালা' কবিতায় আমেরিকার কুৎসিৎ চেহারা তুলে ধরেছেন একেবারে সরাসরি। সুবোধ কমিউনিজমের বিষয়-

আশয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কমিউনিস্টদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন। বিশ্বায়নের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। প্রখর রাজনৈতিক চেতনায় জারিত সুবোধের কবিতা। থানা, পুলিস, মন্ত্রী, কেবিনেট নিয়েও তিনি শাণিত বক্তব্য রেখেছেন কবিতায়। সুবোধের কবিতায় বক্তব্য প্রাধান্য পেলেও তার প্রকাশভঙ্গিতে কবিত্ব আছে, ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের অলঙ্কারকে তিনি এড়িয়ে যাননি কখনো। কিংবা বলা যায়, এত ঝাঁজ মেশানো বক্তব্যেও অলঙ্কার পরিয়ে কবিতা বানানোর অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করেছেন আমাদের কবি সুবোধ সরকার।

কেবল অলঙ্কারপ্রয়োগে নয়, সুবোধ সরাসরিও বলতে পারেন। এত তীক্ষ্ণ, তীব্র তাঁর ভাষা! একবিংশ শতাব্দীতে এসে এত সরাসরি বললে কী করে কবিতা হবে? – এমন ধারণা মনে আসবেই। কিন্তু গোটা কবিতা পড়া হয়ে গেলে নিজের জবাব নিজেই দেয়া যাবে। বাংলাদেশের ষাট দশকের কবি মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, রফিক আজাদ ও আবুল হাসান যে ধরনের কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন, সুবোধ সরকারের সেই ধরনের গুণ প্রত্যক্ষ করি। আমি সুবোধ সরকারের কবিতায় তাঁদের কবিতার প্রভাব আবিষ্কার করছি না। আমি কেবল ধারাবাহিকতাকে চিহ্নি করতে চাইছি। সুবোধের সময়ে অর্থাৎ দশকে বাংলাদেশে আবিদ আনোয়ার, আবিদ আজাদ, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল-াহ, রবীন্দ্রনাথ অধিকারী এই ধরনের কবিতা লিখেছেন। কিন্তু সবাই এই গল্পের আঙ্গিকটা ছেড়ে দিয়ে নতুন করে লেখার চেষ্টা করছেন। জয় গোস্বামী, রণজিৎ দাশ, মৃদুল দাশগুপ্তও নিজস্ব কাব্যভাষা খুঁজে নিয়েছেন। কিন্তু সুবোধ সরকার একই আঙ্গিক আঁকড়ে ধরে এখন নিজস্ব আঙ্গিক বানিয়ে ছেড়েছেন। তাঁর কবিতায় চরিত্র থাকে। মধ্যম পুরুষ বা নাম পুরুষ না থাকলে উত্তম পুরুষই হয়ে ওঠে সি্য় চরিত্র। ওই চরিত্র কথা বলে, অনুরোধ করে, শাসায়, নীতিকথা শেখায়। কখনো কখনো কবির ব্যক্তিসত্তা এবং অধ্যাপক-সত্তাও যেন সি্য় হয়ে ওঠে। একটি কবিতার কথা বলি– এক ছাত্র রাসবিহারী থেকে মোটরবাইকের পেছনে চড়িয়ে তার বান্ধবীকে নিয়ে সল্টলেকে ঘুরতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মার যায়। তো তারুণ্যের সেই মৃত্যুকে নিয়ে কবি লিখেছেন–

এরপর থেকে মোটরবাইকে বসা দুটো ছাত্রের বয়সী ছেলেমেয়ে
দেখলেই ভেতরটা ছ্যাৎ করে ওঠে
নতুন হেলমেট। হেলমেট দিয়ে ঢেকে রাখা চোখের জল।
শোনো, আমরা যারা মাস্টারমশাই তাদেরও চোখে জল থাকে
হেলমেট দিয়ে নয়, বই দিয়ে ঢেকে রাখি।
[রাবসবিহারী থেকে সল্টলেক, 'একশো কবিতা', পৃ. ৩৭]

বিশ্বজুড়ে আজ নারীবাদ শব্দটি বেশ জোরোসোরে আলোচিত হচ্ছে। জেন্ডার নিয়ে ব্যাপক গবেষণা, ব্যাপক কর্মসূচি পালিত হচ্ছে বিশ্বের সকল দেশে। নারীবাদী আন্দোলনে কেবল নারীরাই নন, পুরুষরাও এগিয়ে আসেন। মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্যে নারীর মুক্তির বিকল্প নেই। কিন্তু নারীর মুক্তি আটকে আছে পুরুষশাসিত সমাজের একচোখা নীতির কারণে। এই সব নীতির বিরুদ্ধেও সুবোধ কলম ধরেছেন। ধর্ষণের জন্য প্রতি্য়াশীল নারীপুরুষদের একটি মহল নারীর উত্তেজক পোশাককে দায়ী করে থাকে। এরকম প্রেক্ষাপেটে নারীনেত্রী মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিকে ব্যবহার করে সুবোধ কবিতা লেখেন–

মেয়েরা কেন রাস্তায় উত্তেজক পোশাক পরে বেরোয়?
আর পারলেন না মৈত্রেয়ী চট্টেপাধ্যায়, সপাটে জবাব দিলেন
'তাহলে তো যারা বিকিনি পরে তাদেরই বেশি ধর্ষিত হওয়ার কথা'।
...
শুনুন একটি মেয়ে কী পরবে, কীভাবে হাসবে, কোথায় দাঁড়াবে
সেটা তাকেই ঠিক করতে দিলে ভালো হয়
পুরুষ যন্ত্রটি আপনার, আপনি নিজেই ওটার দায়িত্ব নিন।
[ধর্ষণ, 'একশো কবিতা', পৃ. ১৪২]

এত সহজ-সরল ভাষায় মোক্ষম কথাটি বলতে পারেন সুবোধ সরকার। তাঁর ভঙ্গিটাই বেশ উপভোগ করার মতো। ছোটখাট বোমাবাজদের পুলিশ ধরে কিন্তু পোখরান, বালুচিস্তানে যারা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শক্তিপরীক্ষা করে তাদের কিছুই হয় না। এই বক্তব্যও উঠে এসেছে সুবোধের কবিতায়। সুবোধের কবিতায় বিষয়বৈচিত্র্য তাকিয়ে দেখার মতো। টানা গদ্যে তিনি লিখে গেছেন চমৎকার সব কথা। তাঁর কবিতার কিছুকিছু চরণ পড়তে গেলে দাগ কেটে থাকে মনের মধ্যে। সুবোধ সরকারকে মনে রাখতে কিংবা মূল্যায়ন করতে এমন কিছু চরণ বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ব্যাখ্যার অপেক্ষা না করেই চরণগুলোকে হাজির করা যায়–

১. চলি-শ বছরের লোককে প্রেম সম্পর্কে পরামর্শ দিতে নেই। [দেবদাস]
২. দেশটা কিনবেন না বেচবেন সেটা মোবাইরই ঠিক করে দেয় আজকাল। [রামায়ণ, মার্চ ১৯৯৮]
৩. পৃথিবী সুন্দর, কিন্তু সবসময় নয়। [পৃথিবী সুন্দর]
৪. ঘাড়ের কাছে কেউ নিঃশ্বাস ফেললে মনে হয় ওর মতলব আছে। [ঘোড়া কেনার টাকা]

৫. আকাশপথ চিনে চিনে যে পাখি ফিরে আসে তারও কিছু চিহ্ন থাকে। [আলো]
৬. বসন্তকালে বড়লোকের মেয়েরা পাগল হয়ে যায়। [সুবাতাস]
৭. পুরুষ যন্ত্রটি আপনার, আপনি নিজেই ওটার দায়িত্ব নিন। [ধর্ষণ]
৮. খবরের কাগজ পড়েপড়ে একটা জাতি পুরো নষ্ট হয়ে গেল । [উপদেশ যা কিনা গির্জার দেয়ালে লেখা থাকে না]
৯. কাউকে বিশ্বাস করার আগে একটু ঝাঁকিয়ে নেবেন। [উপদেশ যা কিনা গির্জার দেয়ালে লেখা থাকে না]
১০. কবিতার পাণ্ডুলিপি জলে ফেলে দিলেই, কবিতা ডুবে যায় না। [তুকারাম]

এরকম আরো চরণ আছে সুবোধের কবিতার মধ্যে। আমরা বুঝেতে পারি যে, প্রকৃত কবি হওয় না উঠলে এরকম বাণীময় চরণ সৃষ্টি করা যায় না। এই বাক্যগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কাজে লাগবে বলে মুখস্ত করে রেখেছি।

সুবোধ সরকার মহারাষ্ট্রের সাধক-কবি তুকারাম (১৬০৮-১৬৪৯)-কে নিয়ে একটি অসাধারণ কবিতা লিখেছেন। শূদ্র সম্প্রদায়ে জন্ম নেয়ার অপরাধে (!) মারাঠি ব্রাহ্মণরা তুকারামের কবিত্বকে অস্বীকার করে। তাঁর তিনশো কবিতাকে পাথর বেঁধে নদীতে ফেলে দেন। ব্রাহ্মণরা মনে করতেন যে, কাব্যরচনা কেবল ব্রাহ্মণদেরই কাজ, শূদ্রদের তাতে কোনো অধিকার নেই। লোকবিশ্বাস এই যে, সেই কবিতা জল থেকে উঠে এসছিল। কিংবা ব্রাহ্মণকন্যা স্বপ্নে তুকারামের সাক্ষাৎ পায় এবং ওই তিনশো কবিতা তাঁর মুখস্থ হয়ে যায়। এই কথা স্বামীকে জানালে স্বামী তাঁকে প্রহার করে এবং তাড়িয়ে দেয়। ওই ব্রাহ্মণকন্যার মুখেমুখেই বেঁচে থাকে তুকারামের কবিতা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, তুকারামের প্রায় ৫হাজার গান টিকে আছে। তুকারামকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তী আছে। তো যাই হোক, সুবোধ সরকারের কবিতাটি ইতিহাসের নবমূল্যায়ন হিসেবে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এখনো সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদ ঘৃণ্যভাবে টিকে আছে। কেবল সাহিত্যে নয়, রাজনীতিতে, জীবনযাপনের সকল ক্ষেত্রেই পেশীশক্তির জয় দেখে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত সত্য একদিন জয়ী হয়। সত্যকে নদীতে ফেলে কিংবা গলা টিপে খুন করা যায় না। সে অন্যরূপে বাস্তবে উঠে আসে। এই সত্যটিই প্রকাশ করেছেন কবি সুবোধ সরকার–

৩৮ বছর বয়সে, তুকারাম, আপনাকে হত্যা করা হলো
কিন্তু ব্রাহ্মণেরা একটা ছোট্ট সত্য বুঝতে পারেনি সেদিন
কবিতার পাণ্ডুলিপি জলে ফেলে দিলেই, কবিতা ডুবে যায় না।
[তুকুরাম, 'একশো কবিতা',পৃ. ১৪৭]

সুবোধ সরকারের এই একশো কবিতার ভেতরে একশো রকমের কবিতা রয়েছে। সুবোধের কবিসত্তাকে বুঝতে খুবই কার্যকর এই কবিতাগুলো। টানাগদ্যে লিখেছেন, ছন্দ-অন্ত্যমিলেও লিখেছেন। তবে সবকিছু ছাপিয়ে কাহিনী কিংবা রূপকগল্পের ভেতর দিয়ে বলা কবিতাগুলোই জ্বেলে দেয় সুন্দরের আশ্চর্য বিভা। সুবোধ সরকারকে নিয়ে আমার মৌহূর্তিক কবিতা নিবেদন করে ধন্য হতে চাই–

কবিরা ব্রাহ্মণ হয় এই কথা লেখা আছে মনুসংহিতায়
তুমি তাঁকে অস্বীকার করো কোন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জোরে
যেহেতু তুমিও কবি, তাই তুমি নিজে নিজে সেজেছ ব্রাহ্মণ
তোমাকে প্রণতি আজ এই পোড়া কার্তিকের বৃহস্পতি-ভোরে।

ঊধ্বর্তন এক কবি নিজেকে প্রচার করে ষাটের ব্রাহ্মণ
অধস্তন কাব্য করে, এই অপরাধে নামে খড়্গ কৃপাণ
বঞ্চিতরে ভালোবেসে কিছু লোক এঁনে দেয় তিলকের মাটি
অধস্তন কবি ছাড়ে নিয়মিত জীবিকার মোহন আহ্বান।

ষাট তো বালাই ষাট, নব্বই এনেছে জেনো নতুন সকাল
এক পা কবরে রেখে আর কত ষড়যন্ত্র, ও হে বুড়ো ভাম ?
নির্বীর্য নাটের গুরু, একদনি ভণ্ডামির দিন শেষ হবে–
শূদ্ররাও কবি হয় এই সত্য এনেছেন সাধু তুকারাম।

সকলেই কবি নয়, কারো চোখে বাস করে সক্রিয় ধূর্ততা।
তুকারাম জয়ী হয়, জয়ী হয় শূদ্র আর কাব্যের ক্ষমতা। *[১৬.১১.২০০৬]*

সুবোধ সরকার জয়ী কবি। তাঁর সময়ের উলেলখযোগ্য কবি হিসেবেই নন, বাংলা কবিতার মূলস্রোতেই তাঁর অবস্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে, তাঁর কবিতা পাঠেই কেবল এর সত্যতা অনুধাবন করা যাবে। সামনাসামনি আলাপ করে বুঝতে পারি নি, সুবোধের ভেতরে এত তেজ, অপরিমেয় কাব্যক্ষমতা। বই হাতে পাওয়ার চারবছর পরে হলেও তাঁকে নিয়ে লিখতে বসতে হয়েছে আমাকে। সুবোধের কবিতাই আমাকে বাধ্য করেছে। এই বাধকতাকে আমি মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছি। আমি মনে করি যে, যত দিন যায়, সুবোধের কবিতার গুরুত্ব তত বাড়ে। আমার কাছে অন্তত সেরকমই ধরা পড়েছে। অন্য পাঠকের কাছেও সুবোধ সরকার প্রতিদিন নতুন, চিরদিন অমলিন কবিতার জনক হয়ে বেঁচে থাকবেন।

[ড. তপন বাগচী। কবি ও গবেষক। রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং কনসালট্যান্ট, আদার ভিশন কমিউনিকেশন, ঢাকা। ঠিকানা : পলল প্রকাশনী, ৪৭ আজিজ মার্কেট (নিচতলা), শাহবাগ, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭১৩০৬৭৯০৯। মেইল : drbagchipoetry@gmail.com]